OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 297 - 305
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যা

অসীমা সাহু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর
Email ID : sahooasima.1990@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword

Narayan Sanyal, Partition, Bakultala P.L. Camp, Balmik, Aranyadandak, Refugees, Political Upheaval, Humanity, Rehabilitation.

Abstract

The Partition of India in 1947 was a cataclysmic event that uprooted millions, forcing them to migrate across newly drawn borders. This mass displacement not only resulted in the loss of homeland but also led to a profound crisis of identity, culture, and survival. The trauma of forced migration and the struggle for rehabilitation have been central themes in many literary works, particularly in Bengali literature. Among the notable voices, Narayan Sanyal's novels- Bakultala P.L. Camp, Balmik and Aranyadandak - offer a nuanced and multidimensional portrayal of the refugee experience, capturing both the grim realities of displacement and the resilience of the human spirit.

Sanyal does not merely document the deplorable living conditions of refugees in camps and colonies but also emphasizes their agency, determination, and indomitable humanity. His works explore the psychological and emotional struggles of those who lost everything, yet managed to reconstruct their lives with perseverance and self-respect. Bakultala P.L. Camp presents a stark yet deeply human portrayal of refugee rehabilitation centers, highlighting not only the suffering within but also the extraordinary strength and solidarity among the displaced. Balmik delves deeper into the questions of exile, alienation, and the search for identity, portraying how individuals redefine themselves amidst socio-political turmoil. In Aranyadandak, Sanyal depicts the adversities faced by displaced people as they attempt to build a new life in unfamiliar surroundings.

What distinguishes Sanyal's approach is his refusal to portray refugees merely as victims of political upheaval. His narratives challenge conventional perceptions of displacement by illustrating how refugees, despite their losses, contribute to the social and economic fabric of their adopted communities. Through these stories, Sanyal provides a literary testimony to the resilience of the human spirit, showing how individuals can overcome even the most devastating circumstances through sheer determination and a profound sense of humanity.

This paper seeks to explore how the select novels of Narayan Sanyal redefines the discourse on displacement, survival, and self-reconstruction. By

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

examining his portrayal of the refugee experience, this study aims to highlight the significance of his works in understanding the long-term impact of Partition on the Bengali refugee psyche.

Discussion

ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-স্বাধীনতা-দেশভাগ — উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যেন এক সূত্রে গাঁথা। দেশভাগের অনিবার্য ক্ষত রূপেই দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যা। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে হঠাৎ করেই তাদের মাতৃভূমিটা বিদেশ হয়ে গেল, বহুকালের বন্ধু প্রতিবেশীরা শত্রু হয়ে গেল। নিজের জন্মভূমি থেকে ছিন্নমূল হতে বাধ্য হল অসংখ্য মানুষ। শরণার্থী হিসেবে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান তথা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রবল মানবিক সংকটের সম্মুখীন হল তারা। শরণার্থী শিবিরে অথবা তথাকথিত পুনর্বাসনের পর তাদের সামগ্রিক জীবনচর্যার চিত্র ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছিলেন লেখক নারায়ণ সান্যাল। পেশায় তিনি ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কর্মসূত্রেই তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে যুক্ত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প' (১৯৫৫)। পরবর্তীকালে লেখা 'বল্মীক' (১৯৫৮) এবং 'অরণ্যদণ্ডক' (১৯৬২) উপন্যাস দুটিতেও আছে সেই উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষের জীবনযাপনের ছবি। এই তিনটি উপন্যাসেই লেখক নারায়ণ সান্যাল উদ্বাস্তু সমস্যার কথা লিখেছেন। 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প'-এ লেখক উদ্বাস্তু মানুষদের 'ভূতপূর্ব মানুষ' বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি সেই ভূতপূর্ব মানুষদের ক্যাম্পজীবনের কথা বলেছেন। সরকারি ডোল (Dole) নির্ভর ক্যাম্পবাসী মানুষরা কীভাবে কর্মবিমুখ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, বিরুদ্ধ প্রতিবেশে কীভাবে তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে— এই উপন্যাসে সেই ছবি রয়েছে। পুনর্বাসনের নতুন গড়ে ওঠা কলোনিগুলিতে রাজনৈতিক অশুভ আঁতাতের কারণে অসহায় ছিন্নমূল মানুষগুলো কীভাবে আরো বিপন্ন হয়ে পড়ছে— সেই ছবি আছে 'বল্মীক' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের প্রেক্ষিতে লেখক দেখিয়েছেন ওপার বাংলায় ঠিক যে মানুষগুলো বাস করত এপার বাংলায় চলে আসা মানুষগুলো যেন ঠিক তারা নয়, তাদের প্রেতচ্ছায়া। আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তাদের স্বভাবে এই বিরূপ পরিস্থিতির অভিঘাতে। 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন পেয়ে উদ্বাস্তু মানুষেরা সেই ঊষর ভূমিতেই সোনার ফসল ফলানোর প্রয়াস করছে। আবার নতুন প্রজন্ম তাদের পৈতৃক পেশার পরিবর্তে যুগোপযোগী পেশা বেছে নিয়ে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার ঐকান্তিক প্রয়াস করছে। নারায়ণ সান্যালের তিনটি উপন্যাসেই মানুষের অসহায়তা-যন্ত্রণা-বঞ্চনার কথা থাকলেও সেটিই উপন্যাসের মূলকথা নয় বরং প্রতিটি উপন্যাসেই সমস্যার ঊর্ধ্বে উঠে আশার আলোকবর্তিকা উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসগুলির চরিত্রেরা যেন তাদের দুর্ভাগ্যের বিপরীতে প্রতিস্পর্ধী হয়ে মাথা তোলে। সমস্যা নয়, সংকট নয়, প্রেম আর মানবতাই জয়লাভ করে।

লেখক নারায়ণ সান্যালের প্রথম উপন্যাস 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। শিবপুর বি. ই. কলেজের পাঠ শেষ করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। সে সময় দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে। ওপার বাংলা থেকে সর্বহারা মানুষ দলে দলে এপার বাংলায় আসছে আশ্রয়ের খোঁজে। ডা: বিধানচন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশে, উদ্বাস্তুদের থাকবার জন্য বাড়ি তৈরির বন্দোবস্ত করতে হবে। সেই কাজেই যোগ দিলেন তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার নারায়ণ সান্যাল। লেখক নারায়ণ সান্যালের প্রথম উপন্যাস 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প'-এ সেই উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষের জীবনের গল্প স্থান পেয়েছে। তাই উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লেখা আছে—

> "সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যারা—
> মানবিকতার পূর্ণমর্যাদা পেল না,
> সেই সব হতভাগ্য ভূতপূর্ব মানুষের উদ্দেশ্যে"[১]

উপন্যাসের নায়ক ঋতব্রত বোস, উপন্যাস-লেখকের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। লেখক এ উপন্যাসে উত্তম পুরুষে নিজের কথা বলেছেন, তিনিও উপন্যাসের একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তবে উপন্যাসে তাঁর নামের উল্লেখ নেই। লেখক এ কাহিনির

রসদ সংগ্রহ করেছেন বন্ধু ঋতব্রত-এর ডায়েরি থেকে। এছাড়াও ঋতব্রত ও তার স্ত্রী-র সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে শুনেছেন কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা, কখনো বা ঋতব্রতের স্ত্রী— মিসেস বসু কিছু কথা জানিয়েছেন, যা তাঁর স্বামীর ডায়েরিতে স্থান পায়নি। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করে লেখক তাঁর বন্ধু ঋতব্রত-র কর্মজীবনের প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন— এমনটাই লেখক নারায়ণ সান্যালের প্রথম উপন্যাস ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’-এর বিষয়।

উপনাসের কাহিনি অনুযায়ী ঋতব্রত বোস সরকারি এঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলো। কর্মস্থল বাংলা বিহার সীমান্তের কাছাকাছি একটি পি.এল. ক্যাম্প— নাম ‘বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প’। পি.এল. বা পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি, অর্থাৎ সরকারের স্থায়ী পোষ্য। কারা এই পি.এল.? দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার স্বাধীন ভারতে এসে আশ্রয় পেয়েছিল এই উদ্বাস্তু শিবিরে। তারপর কেউ বা সরকারি সাহায্যে, কেউ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে চলে গেল, নতুন করে জীবন শুরু করলো। এরপরও যারা রয়ে গেল তারা পঙ্গু অথবা অশক্ত। এরাই হল সরকারের স্থায়ী পোষ্য পি.এল.। এদের বাসস্থান, ক্যাম্পের ব্যারাকগুলি মেরামতির কাজেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রতের এই ক্যাম্পে আসা। ক্যাম্পের মানুষের জীবনচিত্র যেভাবে ঋতব্রতের চোখে ধরা পড়েছে, তা-ই এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ক্যাম্পের জীবনটা বৈচিত্র্যহীন। ক্যাম্পবাসী মানুষরা ডোলভুক, তাই ভিড় হয় ডোল অফিসের সামনে। ডোল অফিস থেকে প্রাপ্তবয়স্করা পনেরো দিনের জন্য মাথাপিছু চার টাকা নয় আনা করে পায়, ছোটরা পায় তিন টাকা দুই পয়সা। এখানে আট বছর বয়স হলেই এরা সাবালক পি.এল., তাই আট বছর বয়স হয়েছে কি না সেটা অনেক সময় বাক্-বিতণ্ডার বিষয় হয়ে ওঠে। ক্যাস-ডোল অফিসের সামনেই রয়েছে রেশনের গুদাম। কার্ডে লিখিয়ে রেশন নিয়ে যেতে হয়। পনেরো দিনের জন্য রসদ দুই সের চাল, দুই সের আটা আর চৌদ্দ ছটাক ডাল। বয়স আট বছরের কম হলে অর্ধেক রেশন। ক্যাম্পের জীবন মন্থর গতিতে চলে যায়।

> “দুপাশে দুঃস্থ নরনারীর সংসার-যাত্রা নির্বাহের সাধারণ দৃশ্য। দেওয়ালময় ঘুঁটে। টিনের চালে উঠিয়ে দিয়েছে লাউ-কুমড়োর ডগা। কাঁথা কাপড়, বড়ি শুকোচ্ছে রোদ্দুরে। তেল মাখিয়ে পিঁড়ি পেতে বারান্দায় শুইয়ে দিয়েছে সদ্যোজাত শিশুকে। দড়ির উপর একটা কাপড় টাঙিয়ে রৌদ্র থেকে মাথাটা বাঁচিয়ে রেখেছে। পিটপিট করে নবাগত অতিথিটি দেখছে আজব দুনিয়াকে। এদের দেখলে মনে হয় না। এগুলো এদের ঘর নয়, এরা এখানেই মানুষ হয়নি; ...এরা এখানে প্রবাসী। বরং মনে হয়, এরা যেন এখানে এমনিভাবে আবহমান কাল ধরে বসবাস করে আসছে।”[২]

ক্যাম্পবাসীর মনে কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, পেটভরা ভাত নেই, পরনের কাপড় নেই, ঘরবাড়ি নেই, কিন্তু ঋতব্রতের মনে হয় সবচেয়ে বড় ‘নেই’ টা হচ্ছে এদের ভবিষ্যতের চিন্তা। এরা যেন এদের সমস্ত দায়ভার সরকারের ওপর সমর্পন করে বসে আছে। তার মনে হয় অতি দীন মানুষেরও থাকে ভবিষ্যতের চিন্তা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কিন্তু এদের তা নেই, যে বালক আট বছর বয়সে মায়ের হাত ধরে ক্যাম্পে এসেছিল, আজ সে পনেরো-ষোলো বছরের তরুণ, অথচ আজও সে নিশ্চিন্তে পি.এল. হয়েই আছে। যে শিশুর জন্ম হয়েছে এই ক্যাম্পে সে ও পি.এল.। ঋতব্রত একবার কয়েকজনকে ক্যাম্পের মেরামতির কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু কেউ কাজে আসেনি। কারণ হিসেবে সে জানতে পেরেছিল যে এরা যদি একবার কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয় তবে আর অশক্ত হিসেবে পি.এল. বলে গণ্য হবে না। ফলে নিশ্চিন্ত ডোলভুক জীবনের অবসান ঘটে যাবে। তাই কোনো কাজে ওরা যোগ দেয় না।

ক্যাম্পের এই নিস্তরঙ্গ জীবনেও মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য দেখা যায়— যেমন দেখা দিয়েছিল বিধবা কুসুমকে কেন্দ্র করে। ক্যাম্পের বাসিন্দা কুসুম বিধবা, সে ঋতব্রতর বাসায় রান্নার কাজ করত। কুসুম কলঙ্কিনী, তারাপদর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে— এই ধারণা থেকে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ক্যাম্পের অসংখ্য মানুষ তৎপর হয়ে উঠল। অপরাধীর শাস্তি বিধানে সকল দর্শকই তখন বিচারক। পুরুষ অপরাধীকে যথেচ্ছ শাস্তি দেওয়ার পর নারী অপরাধীর মাথা মুড়িয়ে পথে বের করে দেওয়ার বিধান হল। ঋতব্রতর হস্তক্ষেপে তখনকার মত উৎসাহী শাস্তিদাতারা নিরস্ত হতে বাধ্য হল। পরিণামে ঋতব্রতকেও নানা কটূক্তি শুনতে হয়েছে।

ক্যাম্পের এক একটি ব্যারাকে পাশাপাশি বাস করে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। এরকমই একটি ব্যারাকে থাকে ভদ্রঘরের যুবতী মেয়ে কমলা ও তার বিধবা মা। তাদের পাশেই থাকে বড়খোকা নামধারী এক যুবক, কমলার প্রতি তার কুনজর রয়েছে, কমলার মা তাই একটা পার্টিশনের জন্য আবেদন করে ঋতব্রতর কাছে। ক্রমশ ঋতব্রত এই পরিবারটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কমলা তার বাসাতেই রান্নার লোক হিসেবে আশ্রয় পায়। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। উপন্যাসের একেবারে শেষে দেখা যায় কমলা ও ঋতব্রত দুজনেই বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে। পরিশিষ্ট অংশে লেখক জানিয়েছেন যে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

‘বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ঋতব্রত। বকুলতলা ক্যাম্পে তার কর্মজীবনের ঘটনাই এই উপন্যাসের বিষয়। ক্যাম্পের অধিবাসীদের মধ্যে নানা ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। কর্মসূত্রে যারা ক্যাম্পবাসী তাদের মধ্যে তফাদার সাহেব এই সর্বহারা মানুষগুলোকে ভালোবাসেন। তাদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন। ক্যাম্পজীবনে তিনিই ছিলেন ঋতব্রতর একমাত্র বন্ধু। অপরদিকে ছিল ডাক্তারবাবু, ভৈরবচন্দ্র, বড়খোকাদের দল— ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে তারা সর্বদাই ঋতব্রতর ক্ষতির চেষ্টা করে গেছে। কুসুম দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন নিজের মনে চেপে রেখে ক্যাম্পে এসে আশ্রয় পেয়েছে। কুসুম-বিশ্বনাথের উপকাহিনি থেকে ক্যাম্পবাসী এই ‘ভূতপূর্ব মানুষ’-দের দেশভাগের পূর্ববর্তী জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আছে রামশরণ ঠিকাদারের কথা। সে ক্যাম্পের ব্যারাক তৈরির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে। সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রতর সঙ্গে প্রথম দিকে সে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। অসৎ ব্যবসায়ী রামশরণ ঠিকাদার, অনভিজ্ঞ ঋতব্রতকে ঠকিয়ে নিম্নমানের দ্রব্য সরবরাহ করে বেশি মুনাফা লাভই তার উদ্দেশ্য। ক্রমশ ঋতব্রতও সে বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠল। ঠিকাদারের সঙ্গেও তার বিবাদ বাঁধলো। উপন্যাসের শেষে এসে দেখি রামশরণের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। সঞ্জীব চৌধুরী এ উপন্যাসে ঋতব্রতর ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তার পিতৃস্থানীয়, তার বন্ধুর বাবা। ঋতব্রতর জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান তিনি করে দিয়েছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলি বেশিরভাগই ‘টাইপ’ চরিত্র। বেশিরভাগ চরিত্রের কোনো বিবর্তন দেখ যায়নি।

উপনাসের গঠনশৈলী গতানুগতিক নয়, স্মৃতিকথায় ঘটনার ঘনঘটা যেমন পারম্পর্য মেনে চলে না তেমনি এ উপন্যাসেও ঘটনার বর্ণনা কালানুক্রম মেনে চলেনি, গঠনকাঠামো যেন কিছুটা অগোছালো। ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রতের একটা কবিসত্ত্বা আছে। সে কবিতা লেখে। চিঠি লেখে আড়ালে থাকা কোনো এক ‘রেখা মিত্তির’কে। এই রকম চিঠি থেকেই কুসুমের পূর্বজীবনের কথা জানা যায়।

উপন্যাসের ভাষা সরল, স্বাভাবিক, সাবলীল। প্রতিটি চরিত্রের মুখের ভাষা তার চরিত্রানুযায়ী, অবাঙালি রামশরণ ঠিকাদারের ভাষাও তার চরিত্রের অনুরূপ। চলিত গদ্যে লেখা এই উপন্যাসের ভাষা বেগবান। লেখকের প্রথম উপন্যাস হয়েও ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’ পাঠককে আনন্দ দিয়েছে, চিন্তার খোরাক দিয়েছে, গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

‘বল্মীক’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। উদ্বাস্তু সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখা এটি লেখক নারায়ণ সান্যালের দ্বিতীয় উপন্যাস। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রিয় ‘মেজদি’কে। পূর্ববর্তী উপন্যাস ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’-এ চাকরিসূত্রে ক্যাম্পে আসা ঋতব্রতর চোখে ক্যাম্প জীবনের ছবি ধরা পড়েছিল। এই উপন্যাসে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া একটি একক পরিবারের ছবি এঁকেছেন লেখক। ‘বল্মীক’ উপন্যাসের নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী। ‘বল্মীক’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ উইঢিবি। নানা কারণে উইপোকার বাসস্থান বারবার ভেঙে যায়। তারা আবার নতুন করে ঘর গড়ে, বাস করে। উদ্বাস্তু মানুষগুলিও যেন উইপোকারই মতন। দেশভাগের অভিশাপ মাথায় নিয়ে সাতপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে অন্য দেশে। তারপর এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে, কেউ কেউ পুনর্বাসন নিয়ে চলে গেছে অন্য কোথাও— এভাবেই বারবার তাদের ঘর ভেঙেছে, আবার নতুন ঘর গড়েছে। সেই মানুষদের কথাই বলেছন এ উপন্যাসে। তাই উপনাসটির নাম ‘বল্মীক’।

‘বল্মীক’ উপন্যাসের কাহিনি মতিগঞ্জের বাসিন্দা হরিপদ চক্রবর্তীর পরিবারের গল্প। সেই সূত্রেই উঠে এসেছে নতুন গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনির আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথা। হরিপদ মাস্টারমশাই ছিলেন উমাশশী গার্লস স্কুলের হেডপন্ডিত। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার তাদের, সমৃদ্ধ গৃহস্থ তারা। উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া হরিপদ চক্রবর্তী স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের হাত ধরে

সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে চললেন এপারের উদ্দেশে। ওদের মত আরো সারিসারি মানুষ দলে দলে চলেছে। এপারের উদ্দেশে। তাদের সকলেরই কোলে শিশু, বগলে প্যাঁটরা, মাথায় মোট আর বুকে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। নিরবচ্ছিন্ন জনপ্রবাহ দেখতে দেখতে হরিপদবাবুর মনে হয়েছিল—

> “মানুষ চলেছে গায়ে গায়ে লেগে, প্রশস্ত রেলপথের উপর চাপ ভিড়। ঠেলা-ঠেলি, হুড়াহুড়ি—দীর্ঘ ক'মাইল বিস্তৃত যেন জীবন্ত মানুষের একটা চলন্ত অজগর! বিনা চশমায় একটা মানুষের থেকে আর একটা মানুষকে তফাত করে দেখতে পারছিলেন তিনি। যেন প্রতিটি মানুষের কোন পৃথক সত্তা নেই। ওরা যেন সন্ত্রাসিত পালায়নপর একটি অভীপ্সার উপাদান। অজগরটা চলেছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই। ওর লেজটা দেখা যায় না— কিন্তু কে বুঝি সঙ্গিন দিয়ে খোঁচা দিয়েছে সেই লেজে। ভয়ত্রস্ত সরীসৃপটা ছুটে চলেছে দর্শনা থেকে বানপুর!”[৩]

দেশভাগের পর সাত বছর কেটে গেছে। হরিপদ মাস্টারমশাই ও আরো অনেকের ঠিকানা এখন উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনি। মাস্টারমশায়ের পরিবারে আছে স্ত্রী বিন্দুবাসিনী, বড়ছেলে অনিমেষ, বৌমা কামিনী, নাতি গোরা, বড়মেয়ে নমিতা, ছোটমেয়ে লতু ও ছোটছেলে বাবলু। ওপারের স্কুলের হেড পণ্ডিত এপারে এসে আর চাকরি পাননি। অনিমেষ বি.এ. পাশ, তাকে ওকালতি পড়ানোর ইচ্ছে ছিল বাবার। বর্তমানে সে রিক্সা চালায়, সে-ই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। নমিতাও মেধাবী ছাত্রী, ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে পাত্রস্থ করা যায়নি। কলোনিতে একটি কামরার মধ্যেই সপরিবারে বাস করেন হরিপদবাবু। পরিবারের মানুষগুলি দেশভাগের আগে মতিগঞ্জে যেমন ছিল এই সাতবছর পর তারা আর তেমন নেই, অবস্থার পরিবর্তন মানুষগুলোকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। বাবলু এগারো বছরের বালক, পরিবারের সবার আশা সে-ই লেখাপড়া করে চাকরি করে পরিবারের দুর্দশা ঘোচাবে। অনিমেষের স্ত্রী কামিনী তার বাবা-মায়ের খুব আদরের সন্তান, অভিমানী মেয়ে সে। অনিমেষ অসুস্থ হওয়ার পর সংসারটাকে সচল রাখবার জন্য বাবলুকে দিয়ে সে ট্রেনে চানাচুর বিক্রির ব্যবসা শুরু করেছে। পরিবারের সকলের কাছে সে কথা সে গোপন করেছে কারণ পণ্ডিত পরিবারের ছেলে লেখাপড়া করে চাকরি করবে, এটাই সবার আশা। এই গোপনীয়তা থেকেই পরিবারের সদস্যরা কামিনীকে ভুল বোঝে। অভিমানী কামিনীও সে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেনি। ফলস্বরূপ পরিবারটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। হরিপদবাবু তার দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র বাস করেন। নমিতা চাকরি করে সে সংসারের হাল ধরে। অসুস্থ অনিমেষ আর কামিনীর সংসার অচল হয়ে ওঠে। কামিনীর একমাত্র লক্ষ্য অনিমেষকে সুস্থ করা। বাবলু ঘরছাড়া হয়ে স্টেশনেই থেকে যায়। কয়লা কুড়িয়ে রোজগার করতে থাকে সে। মাত্র এগারো বছর বয়সেই সংসারের দুর্দশা দূর করার জন্য এভাবেই টাকা রোজগার করতে থাকে সে। নমিতাদের সংসারে একটি ত্রিকোণ প্রেমের জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয় ভূষণকে কেন্দ্র করে। ভূষণ ও নমিতার পারস্পরিক ভালোলাগা ও ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে লতুর আকস্মিক প্রবেশ ঘটে। সেই সঙ্গে ভূষণের পিসিমা, নমিতার বাবা-মা সেই আবর্তকে আরো জটিল করে তোলে।

এই একক পরিবারটির পাশাপাশি কলোনির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ছবিও তুলে ধরেছেন লেখক নারায়ণ সান্যাল। বছর পাঁচেক আগে কলোনির ডোলভুক মানুষেরা কাজের দাবী জানিয়ে ঘেরাও করেছিল জেলা সমাহর্তার বাড়ি। সমবেত জনতার মধ্য থেকেই পাঁচজনকে তাদের মুখপাত্র হিসেবে পাঠানো হয়েছিল কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। এই ঘটনার কিছুদিন পর কলোনিকে পাঁচটি ব্লকে ভাগ করা হল। পাঁচটি ব্লকের সেক্রেটারি হল সেই পাঁচজন যাদের ওরাই একদিন মনোনীত করে পাঠিয়েছিল আলোচনার জন্য, সেই গোকুল-বিষ্টু-নবীন। তারপর থেকে—

> “ব্লক সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত কর— তিনি রেকমেন্ড করলে পেতেও পার স্টারভেশন ডোল। ট্রাকে করে বড় বড় ড্রাম এসে পৌঁছাল— গুঁড়ো দুধ ভর্তি তাতে। পিচবোর্ডের গোলাকৃতি আধার। তার গায়ে লেখা আমেরিকার দেশবাসীরা এগুলি উপহার দিচ্ছে ভারতবাসীকে। সে উপহারও কিঞ্চিৎ লাভ করতে পার যদি ব্লক সেক্রেটারিরা অনুগ্রহ করেন। র‍্যাশানের চাল, ধুতি শাড়ি বিতরণ করা হয় এই সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। কিছু লোক কাজ পায়; কিছু পায় ডোল, ফ্রি র‍্যাশান। গোকুলদাস পায় কয়লার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডিপো খোলার অনুমতি— বিষ্টুর জয়হিন্দ কেবিন মাথা তোলে— নবীন পতিতুণ্ডি মহাজনী ব্যবসা শুরু করেন। এঁরা মূলধন কোথায় পেলেন সে প্রশ্নটা করবার সাহস হল না কারও।”[৪]

বছর পাঁচেক পর আবার কলোনির যুবক যুবতীরা একত্রিত হয়েছে, বেকারত্বের জ্বালায় তারা জর্জরিত। এবার তাদের নেতা নিতাই কবিরাজ। নিতাই কবিরাজ বয়স্ক মানুষ, সবাই তাকে ‘ঠাকুর্দা’ বলে ডাকে, পেশায় তিনি কবিরাজ। তাঁর ছত্রছায়ায় কলোনির ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ে উঠল ‘গণকল্যাণ সমিতি’। নমিতাও এই গণকল্যাণ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পুরনো ব্লক সভাপতিদের সরিয়ে নতুন গণকল্যাণ সমিতি কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। উদয়নগর কলোনির বাসিন্দাদের জন্য প্রকৃত উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই সময় নতুন করে আরো উদ্বাস্তু মানুষের দল এসে পৌঁছায় উদয়নগর কলোনিতে। দুর্ভিক্ষপীড়িত এই মানুষগুলো খবর পেয়েছে উদয়নগর কলোনিতে গেলে কাজ পাওয়া যাবে, খাবার পাওয়া যাবে। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ এসে ভিড় করে কলোনিতে। ফলে কলোনির উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়, পূর্ববর্তী পরিকল্পনা মত আর এগোনো যায় না। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গণকল্যাণ সমিতির মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়। ভূষণ, যোগেন— এদের মত তরুণেরা এই নতুন মানুষদের স্থান, দিতে চায় না, তারা এদের আসা বন্ধ করতে চায়। অপরদিকে নিতাই ঠাকুর্দা মনে করেন এই নিরন্ন মানুষগুলো তাদের অতিথি। এদের তিনি এখানেই আশ্রয় দিতে চান। নমিতাও ঠাকুর্দাকেই সমর্থন করে।

নিঃসম্বল কামিনী অনেক চেষ্টায়, অনেক প্রলোভন অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত তার অসুস্থ স্বামী অনিমেষকে সুস্থ করে তোলে। নিতাই ঠাকুর্দার সাহায্যে সে অনিমেষকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অনিমেষ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বাবলু-হরিপদবাবু-কামিনী সকলের পুনর্মিলন হয়। কিন্তু উপন্যাসটির শেষ অংশটি মিলনান্তক নয়, বিয়োগান্তক। নতুন আসা উদ্বাস্তু মানুষদের দলটাকে হঠিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশ-গণকল্যাণ দলের সদস্যদের মধ্যে লড়াই বাঁধলো। নমিতাও সেখানে উপস্থিত ছিল। গণ্ডগোলের মধ্যে এক বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে নমিতার ওপর নেমে এলো চরম আঘাত। সে পড়ে গেল মাটিতে, আর উঠলো না। এভাবেই বোধহয় ত্রিকোণ প্রেমের জটিল আবর্ত থেকে সে সরে গেল। তার প্রিয় লতুকে ভূষণের হাতেই দিয়ে গেল সে।

‘বল্মীক’ উপন্যাসটির মধ্যে একটি একক পরিবারের ছবি রয়েছে। সে ছবির প্রেক্ষিতেই উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষের যন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদি’ (১৯৫৩) নাটকের কথা মনে আসে। সেখানেও একটি একক পরিবারের মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষের কথা বলা হয়েছে।

‘অরণ্যদণ্ডক’ উপন্যাসটি লেখক নারায়ণ সান্যাল রচনা করেছেন ১৯৬০-৬১ কালপর্বে। প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ সালে। প্রথম প্রকাশকালে এ উপন্যাসের নাম ছিল ‘নৈমিষারণ্য’। লেখকের নাম ছিল ‘বিকর্ণ’। ‘মহাভারত’-এর প্রতিবাদী চরিত্র ‘বিকর্ণ’, সেই ‘বিকর্ণ’ নামের আড়ালেই প্রথম দিককার কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন সরকারি চাকরিজীবী লেখক নারায়ণ সান্যাল। উপন্যাসটির কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘নৈমিষারণ্যের ডাক’ নামে।

পি. এল. ক্যাম্পের পরনির্ভরশীল জীবন এবং আর্বান-রুরাল-জবরদখল কলোনিতে উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রামের কথা লেখকের পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাস ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’ ও ‘বল্মীক’ উপন্যাস থেকে জানা যায়। ‘অরণ্যদণ্ডক’ উপন্যাসটিতে লেখক বাস্তুচ্যুত সেই মানুষগুলির অরণ্যবাসের ছবি তুলে ধরেছেন। তাই পূর্ববর্তী উপন্যাস দুটির কয়েকটি চরিত্র এ-উপন্যাসেও স্থান পেয়েছে। তবে কাহিনি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তাই ঐ উপন্যাস দুটি পড়া না থাকলেও এই উপন্যাসটির রসাস্বাদনে কোনো অসুবিধে নেই।

উপন্যাসটি আটটি কাণ্ডে বিভক্ত— অরণ্যকাণ্ড, আদিকাণ্ড, অযোদ্ধাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড, কিস্কিন্ধাকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড। নামগুলি ‘রামায়ণ’-এর অনুরূপ হলেও ‘রামায়ণ’-এর ক্রমটি অনুসৃত হয়নি। উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষগুলো পুনর্বাসন পেয়ে দণ্ডকারণ্যে পৌঁছেছে। তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের কাজে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়েছেন বহু সরকারি অফিসার। তাঁদেরই মধ্যে আছেন— ঋতব্রত, বীরেন মৈত্র, রেখা মিত্তির প্রমুখরা। এই চরিত্রগুলির মধ্যেই কয়েকটি আমাদের পূর্বপরিচিত। ঋতব্রতই ধীরে ধীরে এই উদ্বাস্তু ‘ভূতপূর্ব মানুষ’-এর ইতিহাস সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয় কাণ্ড থেকেই উপন্যাসের কাহিনির সূত্রপাত। গ্রামের নাম কমলপুর। সময়টা তেরশো বাহান্ন সাল। জমিদার কমলাপতি বাবুর সঙ্গে গ্রামবাসীর মিশ্র সম্পর্ক, প্রজাদের অনেক ইচ্ছে-অনিচ্ছে, সুখ-দুঃখকে যেমন তিনি নিজের ইচ্ছের তলায় চাপা দেন তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তিনি গ্রামবাসীর মাথার ওপর ছাতা হয়ে দাঁড়ান। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দিবাকর পণ্ডিত বা দেবু পণ্ডিত এই গ্রামেরই বাসিন্দা। আঠারো বছর বয়সে তারুণ্যের তেজে সে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছিল। বিচারের সময় কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধ অস্বীকার করেছিল। সজ্ঞানে সেই তার প্রথম মিথ্যাভাষণ। তারপর কারাদণ্ড। জেলে থাকার সময়ই তার আলাপ হয়েছিল জেলারের ছেলে বীরেণের সঙ্গে। বীরেণের কথার সূত্রেই পাঠকের সঙ্গে দেবু পণ্ডিতের প্রথম আলাপ। পরিবার-পরিজনহীন দেবু পণ্ডিত, কারোর সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই, আবার কেউ তার শত্রু নয়। কমলপুর গ্রামের দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর সামাজিক জীবন উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। গ্রামের অন্ত্যজ পল্লী বায়েন পাড়া, প্রহ্লাদ বায়েনের পরিবারের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। গ্রামের তাঁতী, কুমোর, কামার, চাষী সকলেরই জীবন-যাপনের ছবি রয়েছে এ উপন্যাসে। গ্রামের আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরের পূজারি শিরোমণি মশায়ের চিন্তাভাবনা পরিবর্তনের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের নায়ক দেবু পণ্ডিত গ্রাম্য টোলের পণ্ডিত। জমিদার কমলাপতিবাবুর দাদার মেয়ে উমা দেবু পণ্ডিতের ছাত্রী। যৌবনের প্রথম পর্বে উমা তার মাস্টারমশাইকে প্রেম নিবেদন করে। দেবুরও উমার প্রতি মুগ্ধতা থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে দেবু তাকে প্রত্যাখ্যান করে। উমার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয়নি। অল্পদিন পরেই উমা গ্রামে ফিরে আসে, আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে। একথা দেবুর জানা ছিল না। উমার সঙ্গে সে অকারণ বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। তারপর দেশভাগ। শ্বশুরবাড়িতে উমার ঠাঁই হল না। সে আর তার মা এপারে এসে কলকাতায় আশ্রয় নেয়। সেখানেই একদিন দেখা হয় দেবুর সঙ্গে। উমা আর দেবু বিয়ে না করে বিবাহিত দম্পতির পরিচয়ে চলে যায় পি. এল. ক্যাম্পে। ততদিনে উমা যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। তাই তার প্রিয় মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি সে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় ক্রিশ্চান মিশনারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তার চিকিৎসা করছেন। তিনি তাকে সুস্থ করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

কমলপুর গ্রামের অসংখ্য মানুষ এ উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠেছে। সতীশ ও রাধার উপকাহিনীটিও উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে। কমলপুর গ্রামের দ্বিজপদ কুমোরের ছেলে সতীশ আর ঐ গ্রামেরই নবীন তাঁতির মেয়ে রাধা। গ্রামে দেবু পণ্ডিতের টোলে পড়ার সময় থেকে তাদের বন্ধুত্ব যৌবনে প্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু রাধার বাবার জাত্যাভিমানের কারণে তাদের প্রেম পরিণতি পাচ্ছিল না। উপন্যাসের শেষে এসে দেখি দণ্ডকারণ্যের নতুন সমাজে তাদের বিয়ে হয়েছে। গ্রামে থাকলে মন্দিরের পুরোহিত শিরোমণি মশাই এ ঘটনাকে অনাচার বলতেন। দণ্ডকারণ্যে এসে তিনিও নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেছেন। বস্তুত উপন্যাসে তাঁর চরিত্রেরই সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে। দেশভাগের পর এপারে আসবার সময় তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েন। অসহায় শিরোমণি মশাইকে তারাপ্রসন্ন মশাই আশ্রয় দেন। তারপর দণ্ডকারণ্যে এসে যখন নতুন কলোনি গড়ে উঠল তখন মায়ের মন্দিরও তৈরি হল। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সে মন্দিরে পূজার দায়িত্ব আর শিরোমণি মশাই পেলেন না। অভিমানে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তারপর তাঁকে দেখা যায় ক্রিশ্চান মিশনারি হাসপাতালে। সকল ধর্মের সারবস্তু এক— এই উপলব্ধি থেকে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে ক্রিশ্চান হয়ে গেছেন।

উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রত্নাকর ঘোষ। জাতে সে গোয়ালা। জাত ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সে কৃষক। এছাড়াও তার আরেকটি পরিচয় দুর্দান্ত লাঠিয়াল সে। কমলপুর গ্রামে তার একটি বিশেষ স্থান ছিল। উদ্বাস্তু হয়ে দণ্ডকারণ্যে আসার পরেও সকলে তাকে মান্যতা দিত। তার নাতি মনুয়া বালক বয়সে গ্রাম ছেড়ে এপারে এসেছিল। দণ্ডকারণ্যেই সে তরুণ কৃষক হয়ে উঠল।

জমিদার কমলাপতির চরিত্রে তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' গল্পের জমিদারের ছাপ আছে। দুজনেই সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিনিধি। কমলাপতিবাবু জমিদারি লাভ ও রক্ষা করার জন্য নানাবিধ পাপকার্যও করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের কিছু জমিদারসুলভ চিহ্নও ছিল তাঁর চরিত্রে। কিন্তু নিজের ছেলে কুপথে গেলে পুত্রস্নেহ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখেনি। শেষপর্যন্ত ছেলের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্পত্তির একটা বড় অংশ দান করে যান গ্রামে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়

স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাঁর সেই মহতী দান পূর্ণতা পাওয়ার আগেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটা করুণ গল্প বলে বায়েন পাড়ার প্রহ্লাদ বায়েন আর তার মেয়ে পদ্ম। বায়েন পাড়া গ্রামের অন্তজ পল্লী। তারা সবাই দরিদ্র। মৃত পশুর চামড়া, মাংস, শিং ইত্যাদি নিয়ে তাদের কারবার। এছাড়া তারা বাজনদার। বছরে একবার, জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজায় বাজনা বাজিয়ে তারা দুটো পয়সা রোজগার করে। প্রহ্লাদ, বায়েন পাড়ার সর্দার, দশাসই চেহারা, গায়ে তার আসুরিক বল। অথচ সেই প্রহ্লাদই তার কিশোরী মেয়ের কাছে শিশুর মত কোমল। মেয়ে পদ্মকে সে বড় ভালোবাসে। পদ্মও বাবা অন্ত প্রাণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নরপিশাচেরা প্রহ্লাদকে বেঁধে রেখে তার সামনেই পদ্মকে ধর্ষণ করে খুন করে। এই দুর্ঘটনার পর প্রহ্লাদ পাগল হয়ে যায়। কিছুদিন পর রেললাইনে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

তারাপ্রসন্ন মশাইও কমলপুর গ্রামের লোক। পুনর্বাসন পেয়ে তিনি ওদেরই প্রতিবেশী। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তিনি। গ্রামেও তিনি সকলের অভিভাবকের মত ছিলেন, এখানেও তাই। জনাবালি শেখ ছিল জমিদারের লাঠিয়াল। লাঠিখেলায় তার অসামান্য ব্যুৎপত্তি। অথচ লাঠি ধরায় তার আশ্চর্য অনীহা ছিল। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানেই সে বেশি আগ্রহী ছিল। বন্ধু রত্নাকর ঘোষকে একবার বলেছিল এসবকিছু ছেড়ে সে অনেক দূরে চলে যাবে, চাষ করবে ভাত খাবে। দাঙ্গার সময় জমিদার পরিবারের মেয়েদের সম্মান রক্ষা করে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে সে নিজে আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। তার পরিবারও ভেসে গেছে। পুনর্বাসনের পর নতুন পাওয়া চাষের জমির সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ রত্নাকরের মনে পড়ে বন্ধু জনাবালির কথা। দিগন্তবিস্তৃত ঊষর কৃষিক্ষেত্রে বর্ষণের পর প্রথম কর্ষণ করেছে নতুন প্রজন্মের নতুন কৃষকেরা— রত্নাকরের নাতি মনুয়া, রসময়ের ব্যাটা ট্যানা, যাদের অনেকের জন্মই হয়েছে ক্যাম্পে এসে। অভিজ্ঞ কৃষকেরা তাদের কৃষিকাজের পাঠ দিয়েছে। কিন্তু বীজধানটা এখনো এসে পৌঁছায়নি। রত্নাকর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়, আশ্বস্ত করে নিজেকে— সুদিনের আশ্বাস।

লেখক নারায়ণ সান্যাল ঋতব্রত চরিত্রটি তাঁর নিজের আদলেই গড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের পূর্তবিভাগ থেকে ডেপুটেশন নিয়ে তিনি দণ্ডকারণ্যে চাকরি করতে গিয়েছিলেন ১৯৬০ সালে। দুই বছর পর সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতার চাকরিতে যোগদান করেন। তার প্রায় কুড়ি বছর পর তিনি আরেকবার কর্মসূত্রেই দণ্ডকারণ্যে যান। সেখানে গিয়ে যা দেখেছেন তা লিখেছেন এই উপন্যাসের ‘নববই-দশকের কৈফিয়ৎ’ অংশে—

> “বিশ বছর পরে গিয়ে দেখেছিলাম ভাস্কল ড্যাম সুসম্পন্ন হয়েছে। খালের জলে মধ্যপ্রদেশের অনুর্বর জমি সোনা ফলাচ্ছে। কিন্তু সে ফসল কেটে কেটে ঘরে তুলছে মধ্যপ্রদেশের কৃষক— কোনও বাঙালী উদ্বাস্তু পরিবার নয় (আমরা কিন্তু ভাস্কল ড্যাম ও সেচের খাল খনন করেছিলাম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাতে)।
>
> প্রসঙ্গত, যে গ্রামটির চিত্র ষাটের দশকে এঁকেছিলাম— যার বর্ণনা পাবেন এ গ্রন্থশেষে— সেই বাস্তব গ্রামটিতেও আমি গিয়েছিলাম আশীর দশকে। যে বাস্তব মানুষের ছায়া দিয়ে গড়েছিলাম কিছু কাল্পনিক চরিত্র— তাদের চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি। তারাপ্রসন্ন বা রত্নাকর ঘোষকে জীবিত দেখব না, এ আশঙ্কা ছিলই; কিন্তু বাদবাকি জোয়ান মানুষগুলো? ঐ যগন্দ, রাখহরি, ছিদেম, নবীন যুগীর জামাই-বেটা রসময় আর আনন্দ? বিশে, পাঁচু, ছিনাথ, সুধাময়, অর্জুন, মাধো? দেবু পণ্ডিত আর উমা? — নেই, নেই, কেউ নেই সে-গ্রামে। গ্রামটা আছে— বাস করে মধ্যপ্রদেশের মানুষ। কেউ আমাকে জানাতে পারল না এ গাঁয়ের সেই ছিন্নমূল মানুষগুলো শেষপর্যন্ত কোথায় গেল— সুন্দরবন, মরিচঝাঁপি ... নাকি দুনিয়ার বাইরে!”[৫]

Reference:

১. সান্যাল, নারায়ণ, ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মার্চ, ২০১৬, পৃ. উৎসর্গ পত্র।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৩. সান্যাল, নারায়ণ, ‘বল্মীক’, (প্রথম প্রকাশ- বেঙ্গল পালবিশার্স, কলকাতা), বর্তমানে– দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, আগস্ট ২০১৯, পৃ. ১৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৫. সান্যাল, নারায়ণ, ‘অরণ্যদণ্ডক’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭, পৃ. ‘নববই দশকের কৈফিয়ৎ’।

Bibliography:

চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাস বহুরূপে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১০
চট্টোপাধ্যায়, হীরেণ, বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২
দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, এস. পি. পাব,কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯১৮
ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের আলো-আঁধার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪
ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে’জ পাব, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪
সান্যাল, নারায়ণ, ‘অরণ্যদণ্ডক’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭
সান্যাল, নারায়ণ, ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মার্চ, ২০১৬
সান্যাল, নারায়ণ, ‘বল্মীক’, (প্রথম প্রকাশ- বেঙ্গল পালবিশার্স, কলকাতা), বর্তমানে– দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, আগস্ট ২০১৯